কাজী মোতাহার হোসেন

সন্‌জীদা খাতুন



কাজী মোতাহার হোসেন

সন্‌জীদা খাতুন



প্রচ্ছদ ও বইনকশা : হাশেম খান

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

কাজী মোতাহার হোসেন-এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত
জীবনী সিরিজ-৩৩

কাজী মোতাহার হোসেন

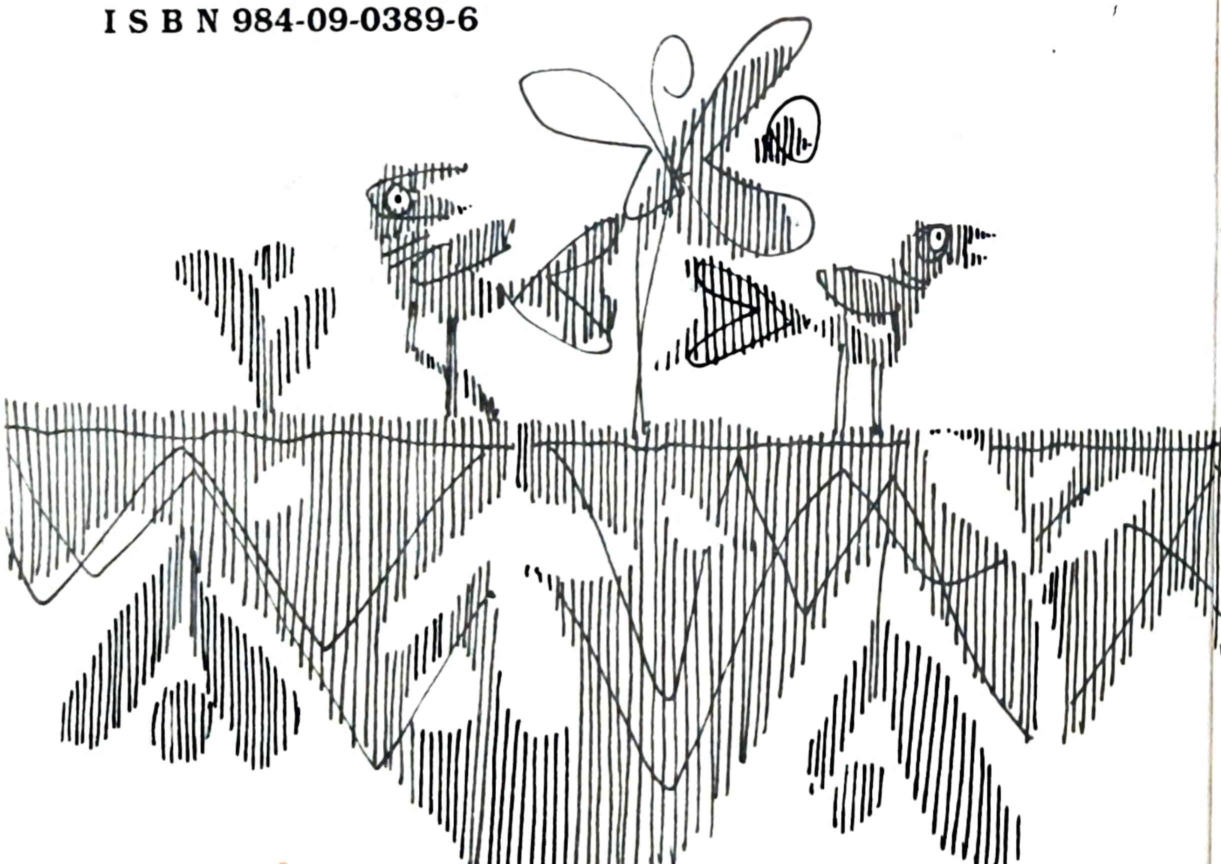
সন্‌জীদা খাতুন

বাশিশুএ ৩৮৯

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরোনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ ও বইনকশা : হাশেম খান। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। মূল্য : ১০.০০

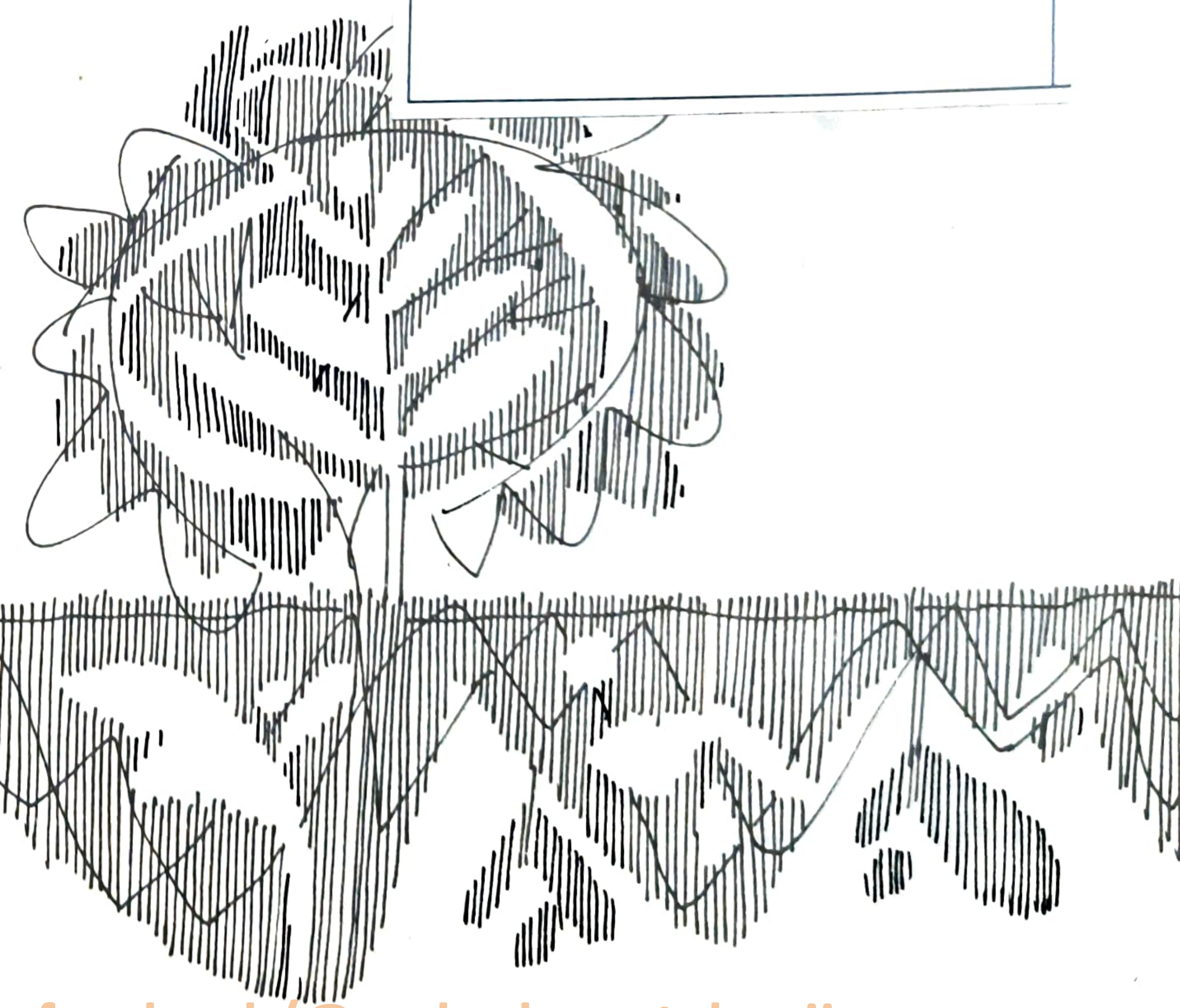
QAZI MOTAHAR HUSAIN (A Biography) by SANJIDA KHATUN. Cover & Book-design : Hashem Khan. Publisher : Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy, Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : June 1997. Price : Tk. 10.00 US$ 1.00

I S B N 984-09-0389-6



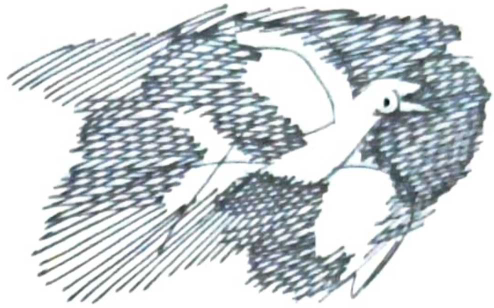


শায়ন্তনী ত্বিষা
সৌমিক হাসীন
প্রকৃতি মনোলীনা





ডানা মেলে ওড়া



আমরা অনেক সময়েই ডানা মেলে আকাশে উড়তে চাই, মনে মনে। কাজী মোতাহার হোসেন—এই মস্ত বড় নামের মানুষটিও নাকি স্বপ্নে উড়ে বেড়াতেন। নিজেই লিখেছেন—"প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, আমি উড়তে পারি, ডানা না থাকলেও শুধু হাত নেড়েই পারি। উড়ে গিয়ে কখনো আমগাছের উপরে কখনো বা বাঁশের ঝাড়ে কোনো বাঁশের আগায় গিয়ে বসতাম। অনেক সময় হুমোবুড়ি সেখানেও তাড়া করত, তখন হয়ত উড়ে গিয়ে তেঁতুল গাছের আগায় বা হিজল গাছের কোটরে আশ্রয় নিতাম।"

এই রকমের মজার স্বপ্ন যিনি দেখেন, তাঁকে কি আমাদের চেয়ে অনেক বড় বলে ভাবা যায়? এ অবশ্য তাঁর খুব ছেলেবেলার স্বপ্ন। জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের ৩০শে জুলাই মামার বাড়িতে। মামার বাড়ি ছিল কুষ্টিয়া জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। বাবার বাড়ি বাহাদুরপুর গ্রামে। গ্রামের নাম তখন ছিল বাগমারা। জেলা ছিল ফরিদপুর। এখন বাহাদুরপুর গ্রাম রাজবাড়ি জেলার ভিতরে পড়েছে। উড়বার স্বপ্ন যখন দেখতেন তখন কাজী মোতাহার হোসেনের বয়স তিন কিংবা চার।

কাজী মোতাহার হোসেনের মজা এই যে, তাঁর বাবা কাজী গওহরউদ্দীন তাঁকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পাঠান নি। খেলাধুলা, আম-জাম কুড়োনো আর সমবয়সীদের সঙ্গে সেসব ভাগাভাগি করে খেয়ে দিব্যি আনন্দে দিন কেটেছে মোতাহারের। তবে ওই ভাগ-বাঁটোয়ারা করবার ভিতর দিয়েই যে বুদ্ধি পেকেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন, খেজুরের কাঁদিতে ঝাঁকি দিয়ে খেজুর পেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ঘটনা থেকে বোঝা যায়। গাছে উঠে পাকা খেজুর খেতে খেতে ঝাঁকি দিয়ে নিচে খেজুর ফেলছিলেন মোতাহার। গাছের নিচে ফলকুড়োনোর বন্ধু ছোট্ট খালার সঙ্গে কথা এই যে, নিচে নেমে দু'জনে সমান ভাগ করে নেওয়া হবে। তা, ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল একটি খেজুর বেশি হচ্ছে। তখন যা হবার তাই হল! মোতাহার বলেন, ওটা আমার, আমি কষ্ট করে

পেড়েছি। সাথি বলেন, "তুই তো গাছের থেকেও কতগুলো খেয়েছিস, এটা আমার।"

তারপরে খেজুর হাতিয়ে নিয়ে খালা দিলেন দৌড়,আর মোতাহার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে দিলেন খালার পিঠে দুই কিল বসিয়ে।

এখন, ওই ভাগের বিদ্যাটি তো ইস্কুলে অঙ্ক কষে শিখতে হয় নি। খেলতে খেলতে হাতে-কলমেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই স্কুলে যোগ-বিয়োগ আর গুণের হিসেব কষা শিখবার পরে ভাগের অঙ্ক নিজে নিজেই কষে ফেলে শিক্ষক চাচা কাজী আবুল হোসেনকে অবাক করে দিয়েছিলেন মোতাহার।

আর ওই যে খালার পিঠে কিল কষানো বিদ্যা, সে বিষয়েও খাটো ছিলেন না মোতাহার। ওদিকে সোনামণির মতন মুখ করে নিজের সম্পর্কে ভাবতেন— "আমি ভাল ছেলে, শান্তশিষ্ট, কারও সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করি নে।"

এই রকম ধারণার কথার পরে খালার সঙ্গে ভাগের মারামারির গল্প লিখে আবার নিজেই লিখেছেন— "বেশ শান্তশিষ্ট ছেলের নমুনা।"

নানারকমের দুষ্টুমি-বুদ্ধি ছেলেমানুষদের হয়েই থাকে। তাই শাসন এড়াবার জন্য দাদি কিংবা ফুফুর কাছে পালিয়ে গিয়ে পিঠ বাঁচাবার বুদ্ধিও ছিল মোতাহারের। সে আমলের শাসনের ধরণটাও কড়া ছিল কিনা! বৃদ্ধ বয়সে কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন— "পান থেকে চুন খসলেই আর রেহাই ছিল না। অমনি পিটুনি। তখনকার নীতি ছিল—ছেলেপিলের স্বভাবেই রয়েছে শয়তানি, এই শয়তানি ছাড়াতে হলে আগেই চাই পিট্টি, পরে উপরি হিসেবে উপদেশও দেওয়া যেতে পারে।"

দুষ্টুমির সময়টুকু পার হয়ে গেলে মোতাহার ভাবতেন—"শান্তশিষ্ট ছেলের মনে কেমন করে এই সব দুষ্টামির উদয় হয়! হয়তো এর উৎস একটা সাময়িক উত্তেজনা, অথবা এই হয়তো শয়তানের কারসাজি। আর শয়তানটা বোধহয় আমাদের দেহের বা মনের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।" অর্থাৎ কিনা দুষ্টুমির দায় মোতাহারের নয়, শয়তানের!

ওদিকে, খেজুর রসের হাঁড়ি থেকে চুরি করে করে রস খাওয়া, পদ্মানদীতে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করা, বৃষ্টির দিনে দৌড়ে গিয়ে ছ্যাৎলা-পড়া

উঠোনে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূর যাবার পাল্লা দেওয়া— দুষ্টুমির কামাই ছিল না। ওই সব নিয়ে বড় হয়ে কী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন— "সেসব অনুপম সুখের দিনের কথা, আজ স্বপ্নের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে!"

সেই কালে ন্যাকড়ার বল দিয়ে ব্যাট-বল খেলা হত। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে নিজেরাই একটা হাতার মতো জিনিস অর্থাৎ ব্যাট তৈরি করে নেওয়া হত। ফুটবলের জন্য কাঁচা জাম্বুরা অর্থাৎ বাতাবি লেবুই ছিল আদর্শ। চামড়ার ফুটবল আরও পরের কথা। খেলবার জিনিসের তুচ্ছতা নিয়ে কোনো আক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না। ওতেই কত আনন্দ উছলে উঠত!

একালের ছেলেমেয়েদের হিসেবে বোকাসোকাও ছিলেন মোতাহার। তাই ছোট দাদির তামাশা বুঝতে না পেরে মহা কান্নাকাটি জুড়েছিলেন একবার। দাদি বলেছিলেন— "দেখ্, তুই যাকে মা বলিস, ও তোর আপন মা নয়। তোর আপন মা মরে গেছে।"

ব্যস অমনি আপন মায়ের শোকে মোতাহারের হাপুস নয়নে কান্না।

তাঁর বোকাসোকা স্বভাবের এক গল্প আছে। ইংরেজির ক্লাসে 'The Clock' নামের লেখা পড়ানো হবে। শিক্ষক আশুবাবু। মানুষের হাতে-হাতে কেন ঘরে-ঘরেও ঘড়ি নেই তখন। তাই আশুবাবু ছেলেদের পাঠালেন দূরের এক বাড়িতে গিয়ে ঘড়ি দেখে আসতে। ছেলেরা ফিরে এলে শিক্ষক মোতাহারকে জিগ্যেস করলেন—"ঘড়ি দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কয়টা বেজেছে?"

"ঘড়ি তো বাজে নাই, টিক টিক করছে শুনলাম।"

আর এক ছেলে বলতে পারল যে, দেড়টা বেজেছে। তাই শুনে মোতাহার অবাক— "দেড়টা আবার বাজে কেমন করে?"

তখন আশুবাবু হাসতে হাসতে ঘড়ি এঁকে ঘণ্টা মিনিটের চিহ্ন বুঝিয়ে ঘড়ি-দেখা শিখিয়ে দিলেন।

দেশ-গাঁয়ে মানুষ কুপি নিভায় ফুঁ দিয়ে। কুষ্টিয়ায় স্কুল জীবনের প্রথম দিকের কথা। রাত জেগে লেখাপড়া শেষ করে বিজলিবাতির বাল্‌ব নেভাবার জন্য মোতাহার টেবিলে চড়ে প্রাণপণে বাল্‌বে ফুঁ দিচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে সে-দৃশ্য দেখে রুমমেট বন্ধু হেসে গড়াগড়ি। পরবর্তী জীবনে দেখা

হলেই সেই বন্ধু বলতেন— "মোতাহার, ফুঁ...!"

এই সরল সহজ হাবাগোবা মানুষটি লেখাপড়া শিখেছেন কিন্তু খুব পাকা বুদ্ধি নিয়ে। তাঁর ছেলেবেলাতে, এই ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে হারাতে পারে নি। ৮ বছর থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত নিম্ন প্রাইমারি অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে দুই বছরে অঙ্ক, বাংলা বর্ণমালা, বাল্যশিক্ষা আর বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ সমস্ত কিছু মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। ফলে, বৃত্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষাতে পুরো নম্বর আদায় করে বৃত্তি পেয়ে গেলেন। সে বৃত্তির টাকা কত ছিল শুনে হেসো না, মাসে দুই টাকা। তখনকার দু' টাকাতে যা-কিছু পাওয়া যেত, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। এখনকার টাকার সঙ্গে তার তুলনা চলবে না। গ্রাম দেশের মানুষের চাহিদাও ছিল অল্প। খরচইবা কী তখনকার গ্রামের জীবনে! দুই টাকাতে তখন দু' মণ চাল কেনা যেত। আর এখন সাধারণ মানুষের খাবার মতন দুই মণ চালের দাম আটশো টাকার ওপরে। তফাৎটা হিসেব করো এবার!

লেখাপড়ার জন্য তখন শ্লেট-পেন্সিলই বলো কি কাগজ কলমই বলো কিছুরই চল ছিল না। বাঁশের কঞ্চির মাথাটা সরু করে কেটে কলম বানিয়ে কলাপাতার উপরে আঁচড় কেটে লেখা হত তখন। আর কালি? সে-ও ঘরে নিজেদের তৈরি করে নিতে হত। বাঁশের ঝরাপাতা কিংবা বাকল পুড়িয়ে মাটির হাঁড়িতে বা মালসাতে রেখে অল্প অল্প পানি দিয়ে একটা লগুড় বা কাঠের দণ্ড দিয়ে ঘোঁটা হত। পরে তাতে শুকনো বাবলা-আঠা মিশিয়ে দিতে পারলে কালি একটু ভাল হত। বাজারে হয়তো কালির বড়ি বা তৈরি কালিও পাওয়া যেত, কিন্তু গাঁয়ে ওসবের ব্যবহার ছিল না। লিখবার জন্য তালের পাতা ছিল ভাল। কারণ কলাপাতার চেয়ে তালপাতা শক্ত। সেই পাতায় একবার লিখে গরম পানিতে চুবিয়ে ধুয়ে নিয়ে আবার লেখা চলত।

বালক বয়সে মোতাহারের খেলার সাথীদের ভেতরে একজনের নাম ছিল ফতু মিয়া। ফতু মোতাহারের চেয়ে বছর আড়াই-এর বড়। তার এক গুণ ছিল, চমৎকার ঘুড়ি বানাতে পারত সে। ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা নিয়েই শুধু ফতু মিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নয়। শহরবাসী পড়ুয়া ছেলে ফতুর সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণ তার নতুন নতুন নানা বিদ্যার পরিচয়। ফতু গ্রামে এলে দুই জনে কত বিষয়েই যে কথা হত! কুস্তিতে মোতাহারের যে ভাল দখল ছিল,

গ্রামের নাম-করা ছেলেদেরও হারিয়ে দিচ্ছিল যে— সে-বিষয়টি ফতু মিয়ার সামনে প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত মোতাহারের পুরোদস্তুর জিত হয় নি যেন।

এই ফতু মিয়াটি কে জানো? মোতাহারদের বাহাদুরপুর গ্রামের নাম-করা প্রবন্ধলেখক কাজী আবদুল ওদুদ। বড় হয়ে শহরে এসেও এই ফতু মিয়ার সঙ্গে মোতাহারের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। দু' জনে মিলে বাঙালি মুসলমানদের বুদ্ধির জড়তা দূর করবার জন্য কাজ করেছেন তখন।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শেখা হলে পরে মোতাহার ডানা মেলে উড়ে গিয়ে বসলেন কিছু দূরের সেনগ্রামের মধ্য ও উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের বাঁশের আগায়। মনে আছে তো তাঁর স্বপ্নে উড়ে উড়ে জায়গা বদল করবার খবর? ১৩/১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সেন গ্রামের স্কুলে পড়ে উচ্চ প্রাইমারি অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ হল। এখানে ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল সবই শেখা হল। সেনগ্রামের শিক্ষকদের কথা মনে করে কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন— তাঁদের কারও হাতে থাকত বেত, কারও বা স্কেল, কেউ বা দুষ্টু ছাত্রদের হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল ঢুকিয়ে চেপে ধরতেন। নিজে অবশ্য বিশেষ শাস্তি পান নি, কিন্তু সাথীদের শাস্তি দেখাও তো কষ্টের।

শিক্ষকদের কারও কারও মুখে হাসি আর নানারকম ছড়াও ছিল অবশ্য! মোতাহারকে তা অপূর্ব আনন্দ দিয়েছে সেই বালকবয়সে।

কুষ্টিয়াতে গিয়ে উচ্চ প্রাইমারি ক্লাসের বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে মাসিক ৩ টাকা হারে আর চুয়াডাঙাতে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মাসিক ৪ টাকা হারে বৃত্তি পেয়েছিলেন মোতাহার। তারপরের লেখাপড়া কুষ্টিয়াতে। ১৫/১৬ বছর বয়স পর্যন্ত কুষ্টিয়া বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তিনি শিক্ষক জ্যোতীন বাবু (এই বানানই লিখতেন তিনি) জ্যোতীন্দ্রমোহন রায় আর স্কুলের সেক্রেটারি রাইচরণ বাবুর বিশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন।

১৭/১৮ বছর বয়সে প্রবেশিকা অর্থাৎ দশম শ্রেণীর পরীক্ষা পাস করলেন কাজী মোতাহার হোসেন। কলেজের ক্লাসে ঢুকবার অর্থাৎ প্রবেশ করবার পরীক্ষা বলে এর নাম ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা। সেটা ১৯১৫ সালের কথা। পূর্ববাংলা আর আসামের মিলিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে ১৫ টাকার বৃত্তি পেয়েছিলেন তিনি। জ্যোতীন বাবু স্যারের ধারণা—তাঁর মোতাহারের আরও ভাল ফল হবার কথা। তিনি নিজেই খোঁজ করে

জানতে পারলেন, কুষ্টিয়ার স্কুলে মেকানিক্স নামে নতুন চালু-করা বিষয়ে মোতাহারের পরীক্ষার খাতাটি খোয়া গিয়েছিল। তাই অন্য পরীক্ষার নম্বরের গড় করে তাঁকে ঐ বিষয়ে ৮০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। জ্যোতীন স্যারের মতে ওই পেপারে মোতাহারের ১০০-তে ১০০ পাবার কথা। ইংরেজিতেও কম নম্বরের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জি আরেকবার খাতা পরীক্ষা করাতে রাজি হলেন না। তখনকার দিনে প্রবেশিকা পরীক্ষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ছিল, সে বোধ হয় তোমরা জানো না। যাই হোক, কেবল পূর্ব বাংলা আর আসাম প্রদেশে প্রথম হওয়াই তো যথেষ্ট নয়! সমগ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীর ভিতরে প্রথম দশ জনের একজন হিসেবে মোতাহারের ২০ টাকার সাধারণ বৃত্তি পাবার সুযোগটা এইভাবে ফস্কে গেল। আদর্শ শিক্ষক জ্যোতীন বাবুই তাতে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রটির প্রতি জ্যোতীন স্যারের স্নেহের কোনো সীমা ছিল না। পরবর্তী জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়া কলকাতাবাসী জ্যোতীন স্যারকে দেখতে গেলে, কণ্ঠস্বর শুনেই প্রিয় ছাত্রকে চিনতে পেরেছিলেন স্যার। নিজের বৃদ্ধ বয়সে একথা বলতে গিয়ে মোতাহার কেঁদে ফেলতেন।

গ্রামের ছেলের জীবন তো বড় সহজ হয় না। কল্পনার ডানা মেলে ওড়াউড়ি করলেও কাজী মোতাহার হোসেন বাস্তবে ছিলেন গ্রামের এক দরিদ্র ঘরের সন্তান। তাঁর বাবা কাজী গওহরউদ্দীন ছিলেন আমিন। অর্থাৎ জমির মাপজোখ করবার কাজ ছিল তাঁর। জমি মাপার কাজ কিন্তু সারা বছর থাকে না, তার জন্য বিশেষ সময় আছে। তাই কাজের মরশুম ছাড়া অন্য সময়ে তাঁর রোজগারের ব্যবস্থা থাকত না। ফলে, আমগাছের ডাল বা বাঁশঝাড় যেখানেই উড়ে বসা যাক না কেন অভাবের হুমোবুড়িটা সব জায়গাতেই তাড়া করে ফিরত মোতাহারকে। তবে শিক্ষাজীবনে মোতাহার নানাজনের কাছ থেকে পদে পদে সস্নেহ অর্থসাহায্য পেয়েছেন। তাছাড়া, বৃত্তি পাওয়া ছাত্রদের তো বেতন দিতে হয় না। থাকা-খাওয়ারই যা খরচ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে কাজী মোতাহার হোসেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। সবচেয়ে ভাল ছাত্ররা এই কলেজে পড়ত তখন। কিন্তু কলেজের পরিবেশ ভাল না-

লাগাতে দ্বিতীয় বর্ষে পড়বার সময়ে রাজশাহী কলেজে চলে যান। ১৯১৭ সালে বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তি পান তিনি। এই বৃত্তিগুলোই তাঁর শিক্ষালাভকে নিশ্চিত করেছিল।

এরপর শুরু হয় তাঁর ঢাকার জীবন। ঢাকা বিভাগের মানুষ হলেও ঢাকা দেখা হয় নি এতদিন। ১৯১৭ সালে তাই কাজী মোতাহার হোসেন উচ্চতর শিক্ষা নেবার জন্য ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকা কলেজ তখনকার নামীদামি কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী এখানে বি. এ., বি. এসসি., এম.এ., এম.এসসি. ইত্যাদি পড়ানো হত। এই ঢাকা কলেজেই মোতাহার বি.এ. অনার্স আর এম. এ. ক্লাসের পড়ালেখা করেছিলেন। ১৯১৯ সালে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় পূর্ববঙ্গ আর আসাম অঞ্চলে প্রথম হয়ে তিনি ৩০ টাকার বৃত্তি পান। ভাবছ, আই.এসসি. পাশ করে বি.এ. অনাস কেন বি.এসসি. অনার্স পাস করবার কথা তো? আসলে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স আর সহযোগী বিষয়েও বিজ্ঞান পড়লেও, আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি আর বাংলা-সাহিত্য নিয়েছিলেন বলে ডিগ্রিটা বি.এসসি. না হয়ে বি.এ. হয়েছিল। এইরকমই ব্যবস্থা ছিল তখন।

বি.এ. অনার্সের বৃত্তির টাকাটা কিন্তু মোতাহার হোসেন নিজে খরচ করতেন না। গ্রামে তাঁর বাবা তখন অসুস্থ। তাই এর সব টাকাই বাবাকে পাঠিয়ে দিতেন। নিজের থাকা-খাওয়ার খরচ চালাতেন ছাত্র পড়িয়ে। ছুটির সময়ে বৃত্তি পাওয়া যেত না তখনকার দিনে। তাই বাড়িতে টাকা পাঠানোর জন্য স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিতে হত এই সময়ে। যেমন ১৯১৯ সালে একবার দৌলতপুরের মোহসীন স্কুলে মাসিক ৫০ টাকা বেতনের চাকরি নিয়েছিলেন।

১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে ইউনিভার্সিটির শিক্ষাজীবন শেষ করলেন কাজী মোতাহার হোসেন। ডানা মেলে বিস্তীর্ণ আকাশে ওড়া শুরু হল এইবার। হুমোবুড়ির ভয়ে তেঁতুল গাছে বা হিজল গাছের কোটরে আশ্রয় নিতে হবে না বুঝি আর।



জীবনে জীবন যোগ করা



ছাত্র অবস্থাতেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির ছাত্র কাজী আকরম হোসেনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল কাজী মোতাহার হোসেনের। কাজী আকরম হোসেন একে তো সাহিত্যের ছাত্র, তায় নিজেও কবি। পরবর্তী জীবনে হাফিজের ফারসি গজল অনুবাদ করে আর সাহিত্যের রস মিশিয়ে 'ইসলামের ইতিহাস' লিখে ইনি সুনাম পেয়েছিলেন।

সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল বলে মোতাহার হোসেন কৈশোরে কাজী আবদুল ওদুদের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনি আকরম হোসেনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তাঁর সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। সেই সুবাদে কাজী আকরম হোসেন তার স্নেহাস্পদ এক জ্ঞাতিবোন সাজেদা খাতুনের সঙ্গে কাজী সাহেবের বিয়ে ঘটিয়ে দিলেন। সেটা ১৯২০ সালের কথা। তখনও তাঁর পড়ালেখা শেষ হয় নি। ভাল ছাত্র হাতে পেলে পড়া শেষ হোক-না-হোক তাকে মেয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না কেউ সে-সময়ে। কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের সঙ্গে আর এক জীবনের যোগ হল। হুগলীর মেয়ে কলকাতাবাসী সাজেদাদের বাসায় উর্দুর চল ছিল বাংলার চেয়ে বেশি। খুলনার মেয়ে মা মোসলেমার প্রভাবে সাজেদা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এই দুই উপন্যাস উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন।

সাজেদা খাতুনের মা মোসলেমা খাতুনের বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। তাই জামাই সাহেবকে লাইব্রেরি থেকে একের পর এক বই এনে দিতে হত তাঁর পড়ার জন্য। তা, সে লাইব্রেরি কাজী মোতাহার হোসেন পেলেন কোথায়? সেকথা বলতে গেলে কাজী সাহেবের চাকরি শুরু করবার কথা বলতে হয়।

১৯২১ সালে কাজী সাহেব পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন সবে। হ্যাঁ, এম.এ.। কারণ, বি.এ.-র পরে এম. এসসি. আর হয় না, এম. এ.-ই হয়। তো, সেই সময়ে পূর্ববাংলার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হিসেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পত্তন হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর জেঙ্কিন্স্

কাজী সাহেবকে ডেমোনস্ট্রেটার হিসেবে কাজে ডেকে নিলেন। ডেমোনস্ট্রেটাররা ছাত্রদের বিজ্ঞানের আঁকাজোঁকা আর ল্যাবরেটরির কাজ শেখাতেন হাতে ধরে। পরীক্ষার ফল না বার হলে শিক্ষক হিসেবে চাকরি দেওয়া যায় না তো আর। ১৯২১ সালের জুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের পরে পরেই প্রায় মোতাহার হোসেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যোগ দিলেন। এর কিছুদিন আগে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতন নামী লোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। এম. এ. পাশ করবার পরে কাজী সাহেব পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকেই কাজী সাহেব শাশুড়ির মনের ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য বইয়ের পরে বই নিয়ে আসতেন ধার করে। আর বাড়িতেও কিনে রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রদের গ্রন্থাবলী।

চাকরিতে ঢুকে পড়বার পরে সেই হুমোবুড়িটা কী করল? মাস্টার মানুষের কতই বা বেতন? বিশেষ করে, সে কালে! তবু জিনিসপত্রের দাম তত চড়া ছিল না বলে কাজী সাহেবের সংসারে বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু তিনি তো কেবল নিজেরটুকু গুছিয়ে নিয়ে খুশি থাকবার মানুষ নন! ১২/১৩ বছর বয়সে একবার তাঁকে একটা সাপ কামড়েছিল। সেই সময়ে বাড়ির সব হুলস্থূলের মধ্যে মোতাহার কী ভাবছিলেন? "আমার নিজের মনে যে ভাব ছিল তা খুব স্পষ্ট মনে আছে; আমি ত মরলামই; কিন্তু আমার বাপ-মায়ের কী হবে? আমার নিজের সঙ্কল্প এবং বাপ-মায়েরও আশা ছিল আমি লেখাপড়া করে বড় হয়ে বড় চাকরি করব, তা-তে আমাদের অনটনের সংসারে সচ্ছলতা আসবে। আমার এই নিয়তটা পূর্ণ করবার আগেই আমি এমন করে মরে গিয়ে বাপ-মায়ের আশা-ভরসা চূর্ণ করে দিলাম। হায় এ কী হল? আশ্চর্যের বিষয় আমার নিজের 'মরণ' সম্বন্ধে কোনো কথা বা ভয়-ভীতি আদৌ আমার মনে উদয় হয় নি।"

এই মোতাহার কি বাপ ভাইবোন সবাইকে ছেড়ে কেবল স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করে সুখী হতে পারেন? তাই হুমোবুড়ির তাড়নাকে উপেক্ষা করে মোতাহার নিজের ছোট দুটি ভাই আর তিনটি বোনকে নিজের কাছে নিয়ে এসে লালন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর হিসেবী বুদ্ধি আর সুগৃহিণী স্বভাবের দরুন টায়েটোয়ে সংসার চলে যেত।

বিয়ের পরে দিনে দিনে ৭টি কন্যা আর ৪টি পুত্রে তাঁর ঘর ভরে



তথ্যগণিত বিভাগের প্রথমবর্ষ এম.এ. ক্লাশের প্রথম ব্যাচের চার ছাত্র মনোয়ার হোসেন, আসকার ইবনে শাইখ, এম. আতিকুল্লাহ, মাসুদ আলী খান। চেয়ারে উপবিষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একাত্তরের শহীদ আ.ন.ম. মনিরুজ্জামান, কাজী মোতাহার হোসেন, কলকাতা থেকে আগত অপর শিক্ষক

উঠেছিল। তাঁর এক জীবনের সঙ্গে আরও কতগুলো জীবনের যোগ! এই ১১ জন আর ৫ ভাইবোন সবাইকে মানুষ করতে দীর্ঘ সময় হুমোবুড়ির সঙ্গে লড়াই চালাতে হয়েছে তাঁর। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সারাটি জীবন। স্ত্রীর সহায়তায় বোনদের ঘরেই পড়িয়ে তৈরি করে বিয়ে দিয়েছেন। একটি ভাইয়েরও বিয়ে দিয়েছেন নিজে। অন্য ভাইরা নিজেদের মতন বিয়ে করে নিয়েছিলেন। বড় মেয়ে যোবায়দা মির্যার 'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি' বইতে তাঁর আব্বুর কথা কতভাবেই বলা আছে। কেমন করে মুখে মুখে নানা বিষয়ের ধারণা দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের, কন্যার অসুখে তাঁর আরোগ্যের জন্য হাওয়া বদলের ব্যবস্থা করেছেন কত ব্যাকুল হয়ে, স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলে একা বড় মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে ভুলো-মনে কী কী কাণ্ড করেছেন।

বড় মেয়েকে মানুষ করেছিলেন মনের মতো করে। লেখাপড়া, খেলাধুলা, গানবাজনা কোনো দিকের শিক্ষাতে ফাঁক ছিল না। প্রথম সংসার জীবনের সব সখ-আহলাদ মিটিয়েছেন বড় কন্যাকে দিয়ে। কোথায় সার্কাস কিংবা জাদু, শচীন দেববর্মণের গান, দিলীপকুমার রায়ের আসর, মহরমের মিছিল, রথযাত্রা— কিনা দেখিয়েছেন-শুনিয়েছেন তাঁকে! পারিবারিক অতিথি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন সবার স্নেহ-আদর পেয়েছেন যোবায়দা। পাঁচ বছর বয়সে কবি-কাকা নজরুলের কোলে বসে আসরে গান গেয়েছেন তিনি।

যোবায়দা কর্মজীবনে ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপিকা। মেজ কন্যা ওবায়দা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, চোদ্দ বছরের ঐকান্তিক সেবা দিয়ে গড়ে তুলেছেন ময়মনসিংহের মেয়েদের মডেল স্কুল। অন্য মেয়েদের মধ্যে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুন। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী আর বিশেষজ্ঞ এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁর ছোট ফাহ্‌মিদা ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং উঁচুদরের রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। সবার ছোট মাহ্‌মুদা চিত্রশিল্পী আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী। আঁকিয়ে হিসেবে স্ট্যাম্প, কয়েন আর টাকার নক্‌শা তৈরি করে ইনি বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। কাজী সাহেবের চার ছেলের ভিতরে দুই জন



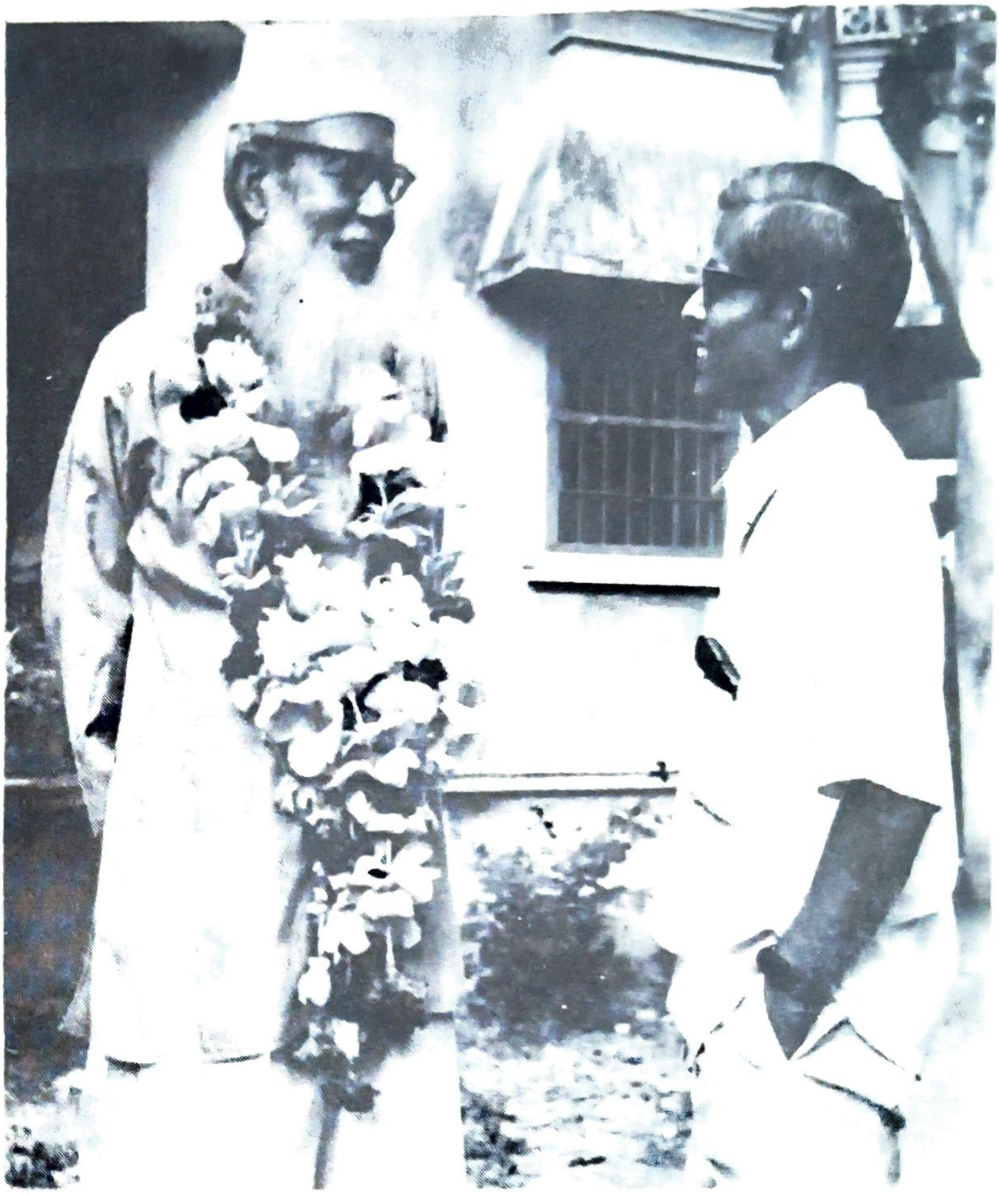
মাঝখানে কাজী মোতাহার হোসেন, তাঁর ডান পাশে পুত্র মাসুদ রানা সিরিজের লেখক হিসেবে খ্যাত কাজী আনোয়ার হোসেন ও বাঁ পাশে অপর পুত্র কাজি মাহবুব হোসেন

স্কুলজীবনেই মারা গেছেন, বাকি দুই জনই লেখক। কাজী আনোয়ার হোসেনকে 'মাসুদ রানা' সিরিজের লেখক আর রহস্যপত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কে না চেনে? ছোট ভাই কাজী মাহবুব হোসেনও ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চারের অনুবাদক হিসেবে পরিচিত। দু' জনেরই বই প্রকাশ হয় কাজী আনোয়ারের 'সেবা প্রকাশনী' থেকে।

আমরা অনেকেই অঙ্কের নামে ভিরমি খাই। আর মোতাহার তো ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কে পটু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সত্যেন বোস

তাঁর বিভাগের এই অল্পবয়সী শিক্ষকটির অঙ্কের দক্ষতা দেখে তাঁকে অঙ্কে এম. এ. পড়তে বললেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে এম. এ. পাশ করবার পরে সত্যেন বাবু কাজী সাহেবকে স্ট্যাটিস্‌টিক্স নামের সংখ্যাতত্ত্বের বিদ্যা চর্চা করতে বললেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিট্যুটে প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের শিষ্য হয়ে কাজী মোতাহার হোসেন এ বিদ্যা শিখে এলেন। সেই থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই বিষয়টি পড়িয়ে এসেছেন। ১৯৫০-৫১ সালে গণিতবিভাগ থেকে সংখ্যাতত্ত্বের বিভাগ আলাদা হয়ে যায়। পঞ্চাশ সালে ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্ট্‌স নিয়ে গবেষণা করে কাজী মোতাহার হোসেন ডক্টরেট ডিগ্রি পান। পূর্ব বাংলায় এই সংখ্যাতত্ত্ব বা তথ্যগণিতের চর্চার শুরু হয়েছে কাজী সাহেবের হাতে। 'তথ্যগণিত' নামটি কাজী সাহেবের নিজের দেওয়া। এই দেশে তথ্যগণিতের তিনিই পিতা। আর পি. এইচ-ডি.র থিসিস লিখবার সময়ে তাঁর কোনো গাইড ছিল না, তিনি কারো সাহায্য ছাড়া একা একাই গবেষণা করেছিলেন—এ এক আশ্চর্য খবর। ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্ট্‌স থেকে তথ্যগণিতবিদ্যায় কাজী মোতাহার হোসেনের নামে 'হুসেইন্‌স চেইন রুল' নামের একটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ কিন্তু এক বড় সম্মানের পরিচয়। এইভাবে বিদেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও মোতাহার হোসেন স্বীকৃতি পেয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রফেসর পদে প্রোমোশন দেয় ১৯৫৪ সালে। অর্থাৎ চাকরি শুরু করবার ৩৩ বছর পরে। প্রফেসর হওয়া বড় সহজ কথা ছিল না তখন। ক্রমে ক্রমে বিভাগীয় প্রধান থেকে ডীন, সংখ্যাতিরিক্ত (Supernumerary) প্রফেসর, ইমেরিটাস (Emeritus) প্রফেসর হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হবার সম্মান পান। এর আগে তথ্যগণিতের গবেষণা আর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্‌স্টিট্যুট অব স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (I.S.R.T) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনি করে শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে অনেক দিন পর্যন্ত যুক্ত করে রেখেছেন কাজী সাহেব।



কাজী মোতাহার হোসেনের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সরদার ফজলুল করিম

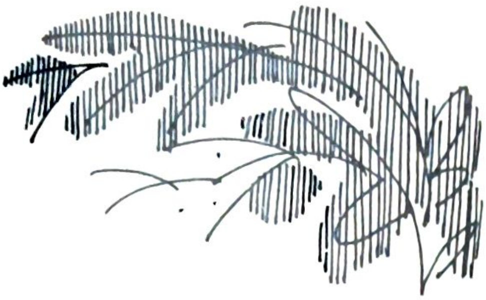


বাঁ দিক থেকে চতুর্থ কন্যা জাহেদা খাতুন, পুত্র কাজী আনোয়ার হোসেন, দ্বিতীয় কন্যা ওবায়দা সা
ভাইয়ের কন্যা হাসিনা মোস্তফা, বড় মেয়ে যোবায়দা মির্যা



দ, কাজী মোতাহার হোসেন, কনিষ্ঠ পুত্র কাজি মাহবুব হোসেন, পঞ্চম কন্যা সন্‌জীদা খাতুন, মেজ

সকল কাঁটা ধন্য করে



১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী মোতাহার হোসেনকে বিশেষ সম্মান জানাবার জন্য ডক্টর অব সায়েন্স বা ডি. এসসি. ডিগ্রি দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে জাতীয় অধ্যাপক পদপ্রাপ্তি আর এই সম্মানটি তাঁর যোগ্যতাকে সত্যিকার স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্মাননার ফুল এতদিনে ফুটেছে তাঁর জীবনে। এখানে একটি খবর দিই। চুয়াত্তর সালে ৭৭ বছর বয়সে কাজী সাহেবের মনে সম্মান পাবার কোনো আকাঙ্ক্ষাই আর ছিল না। জীবন সম্পর্কে একটা উদাসীনতা এসে গেছে ততদিনে। ডি. এসসি. পাবার সময়ে তাঁর সঙ্গে অন্য আর কাদের সম্মান জানানো হল খবর নিয়ে তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—এসব সম্মান কে যে কেন পায়, তার কিছু ঠিক নেই। ওই যে জসীম উদ্‌দীন অতবড় পল্লীকবি—ওঁকে ডি. লিট. (ডক্টরেট অব লিটারেচার) দেওয়া হল না, আর আমি ডিগ্রি পেলাম—এর কি কোনো সঙ্গত কারণ আছে? নিজে সম্মান পেয়েছেন বটে, অপর যোগ্যব্যক্তি কেন সম্মান পেল না সেই দুঃখ তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের সম্পর্কে উদাসীন আর অন্যের বিষয়ে সচেতন এমন মানুষ আজ আমরা কোথায় দেখতে পাব? এমন বড় মনের মানুষ দেখে আমরা ধন্য হই।

জীবনের যুদ্ধই কি মানুষের জীবনের সবটুকু পরিচয়? তা তো নয়। কাজী মোতাহার হোসেনের সমস্ত কষ্ট আর সাধনাকে ধন্য করে তাঁর জীবনে শত শত ফুল ফুটে উঠেছিল। ফুটেছিল তাঁর বন্ধুদের প্রীতিস্পর্শে।

কাজী নজরুল ইসলামের মতন বন্ধু কয় জনে পায়? নজরুল কাজী সাহেবকে ডাকতেন 'মোতিহার' বলে। বন্ধুর ভিতরে অনেক গুণের পরিচয় পেয়ে নজরুল তাঁর তুলনা করেছিলেন মূল্যবান মোতির মালার সঙ্গে। মোতাহারের মনে নজরুলের জন্য যে খাঁটি ভালবাসা ছিল তা জেনে নজরুলও মোতিহারকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। মোতাহারের

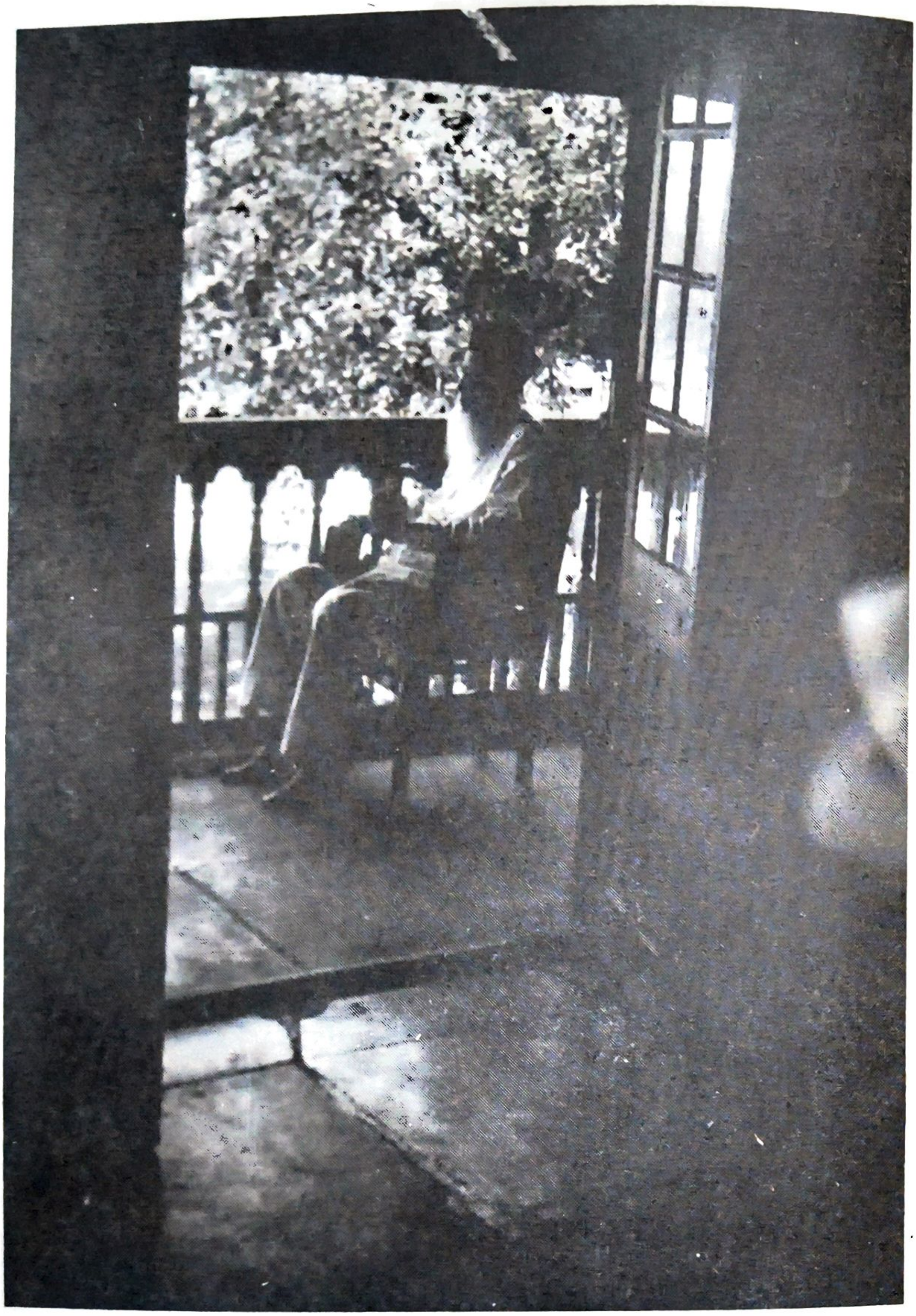
ভালবাসার মূলে ছিল নজরুল-চরিত্রের প্রাণময় সৌন্দর্য আর সাহিত্য এবং সঙ্গীত রচনার আশ্চর্য প্রতিভার জন্য বিস্ময়ের বোধ। ঢাকার সাহিত্য আর সঙ্গীত-রসিক মহলে নজরুলকে নিয়ে যেতেন মোতাহার। নজরুলের সঙ্গে দাবাখেলা নিয়েও খুব যোগ ছিল তাঁর। 'শিউলিমালা' গল্পে নজরুল তাঁর এই দাবাড়ু বন্ধুর কথা লিখেছেন।

মোতাহারের এক মুখ দাড়ি ছিল। একবার কী এক ছুতোয় তাঁর দাড়ি কাটিয়ে ফেলে নজরুল মজা করে 'দাড়ি-বিলাপ' নামে এক কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার আরম্ভটা এই রকম—

হে আমার দাড়ি!
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি,
আমারে কাঙাল করি, শূন্য করি বুক
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক।

ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবারে খুব গানের চর্চা ছিল। সুরেন মৈত্রের মেয়ে 'নোটন'কে নজরুল গান শেখাতে যেতেন, সঙ্গে থাকত বন্ধু মোতিহার। ঢাকার প্রতিভা সোম (রানু)ও ভাল গান গাইতেন। এই রানুকেও নজরুল গান শেখাতে যেতেন। প্রতিভা সোম পরে কবি বুদ্ধদেব বসুকে বিয়ে করে প্রতিভা বসু হয়েছিলেন। নজরুলের ছাত্রী এই প্রতিভা বসু লেখিকা হিসেবেও প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এই রানু সোমের বাড়ি যেতেও মোতিহার ছিলেন নজরুলের সঙ্গী। সে-সব দিনের স্মৃতি যোবায়দা মির্যার বইতে রয়েছে। যেমন, কাজী সাহেবদের বাড়িতে একটা লাঠি ছিল, যার নাম 'নজরুল-মারা লাঠি'। রানু সোমকে একটা বাইরের ছেলে এসে গান শেখায়— সেটা পাড়ার ছেলেদের পছন্দ হচ্ছিল না। একদিন তারা দল বেঁধে ওবাড়ি থেকে ফিরতি পথে নজরুলকে আক্রমণ করল। নজরুল কি পরের হাতে মার খেয়ে পিঠটান দেবার মতন শান্তশিষ্ট ছেলেটি! তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদেরই হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে বন্ বন্ করে ঘুরাতে ঘুরাতে ওদের অ্যায়সা পিট্টি দিলেন যে পালাতে পথ পেল না তারা। সেই কেড়ে-আনা লাঠিটা কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়িতে যত্নে রাখা ছিল অনেক দিন।

কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে গায়ক দিলীপ রায়েরও খুব যোগ ছিল। দিলীপ রায় শুধু গায়ক নন, লেখকও বটে। কাজী সাহেব দিলীপ



কবি নজরুলের স্মৃতি মাখা বর্ধমান হাউজের বারান্দায় (বর্তমান বাংলা একাডেমী) কাজী মোতাহার হোসেন

রায়ের বাবা ডি. এল. রায়ের দেশ-গান আর হাসির গানের খুব ভক্ত ছিলেন। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দিলীপ রায়ের গানের আসরে বসে গান শুনতে ভালবাসতেন মোতাহার হোসেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম কে না জানে? কাজী সাহেবের সঙ্গে সেই শরৎচন্দ্রেরও ভাব হয়েছিল দাবা খেলার সূত্রে। কলকাতায় গেলেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একহাত দাবা খেলে আসা চাই। গল্প আছে, কাজী সাহেব ছাতা আর লাঠি হারাতেন খুব। একবার নাকি শরৎচন্দ্রের বাড়িতে একটা লাঠি ফেলে আসাতে কাজী সাহেবের স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেক পরের এক ছুটির সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দাবা খেলা শেষ করে অভ্যাস বশে দরজার কোণ থেকে আনমনে সেই লাঠিখানাই হাতে করে নিয়ে এলেন মোতাহার। কাণ্ড দেখে সকলে অবাক! কী অদ্ভুতভাবে হারানো-লাঠি ফিরে এসেছে!

কাজী সাহেবের দাবা খেলার নেশা নিয়ে যে কত গল্পই আছে। দাবা তাঁকে বিশ্বসংসার ভুলিয়ে দিত। স্ত্রী হয়তো তাঁকে বাজার করে আনতে পাঠিয়েছেন, পথের ধারে কোথাও নিতান্ত সাধারণ মানুষদের দাবা খেলতে দেখে ইনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপরে একসময়ে ধুলোতে বসে পড়ে জমে গেলেন খেলায়। কোথায় বাজার, কোথায় কী! নিজের বৈঠকখানাতেও, দাবা খেলতে বসলে দিন-রাত্রির হিসেব থাকত না, নাওয়া-খাওয়া সব উঠত মাথায়।

দাবা খেলার প্রতি টান হয়েছিল স্কুল জীবনে এক গুরুগম্ভীর শিক্ষককে এই খেলা খেলতে দেখে। দাবা তো বুদ্ধির খেলা, তাই এ খেলা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাস-পাশা খেলা কিন্তু দু' চোখে দেখতে পারতেন না। তাস-পাশা আর লুডু নাকি আলসেদের খেলা, ওতে মগজের কোনো চর্চা হয় না। নিজের ছেলেদেরও তাই দাবাখেলা শিখিয়েছিলেন। নিজে তো ছোট বড় যে-কারও সঙ্গে এই বুদ্ধির খেলা খেলতে একপায়ে খাড়া ছিলেন।

দাবাখেলায় তিনি প্রশংসাও পেয়েছেন অনেক। চিঠি লিখে লিখে সারা ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে দাবা খেলতেন। একে বলে করেসপন্ডেন্স চেস। একবার দক্ষিণ আফ্রিকান করেসপন্ডেন্স চেস-এ চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় জাতীয় দাবাখেলাতেও কাজী সাহেব চ্যাম্পিয়ন হন। সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি সাত সাত বার চ্যাম্পিয়ন



তথ্যগণিতের খ্যাতিমান অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন

হয়েছিলেন। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন কাজী সাহেব। বাংলাদেশে সবাই তাঁকে দাবাগুরু নাম দিয়েছিল। এদেশের খবরের কাগজে বছরে একবার কিউ. এম. হোসেন দাবা প্রতিযোগিতার খবর বের হয়। তখন কয়েকদিন ধরে প্রতিযোগিতার ফলও ছাপা হয়। এই কিউ. এম. হোসেন কাজী মোতাহার হোসেন (Qazi Motathar Husain) নামেরই সংক্ষেপ। দাবার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নিয়াজ মোরশেদের নাম এ-বিষয়ে আগ্রহী



স্ত্রী মাজেদা খাতুন

বিদেশীরাও জানে। নিয়াজের খুব অল্প বয়সেই কাজী সাহেব তার প্রতিভা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

লেখালেখির দিকেও মহা ঝোঁক ছিল নজরুলের 'মোতিহারে'র। প্রবন্ধই লিখতেন বেশির ভাগ। প্রথম প্রবন্ধের বই 'সঞ্চরণ' ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে আছেন। মোতাহার হোসেন ভয়ে ভয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে একখানা বই পাঠিয়ে দিলেন। ওমা! কিছুদিনের ভেতরেই এক চিঠি এসে হাজির। তাতে প্রশংসা আর শুভেচ্ছা

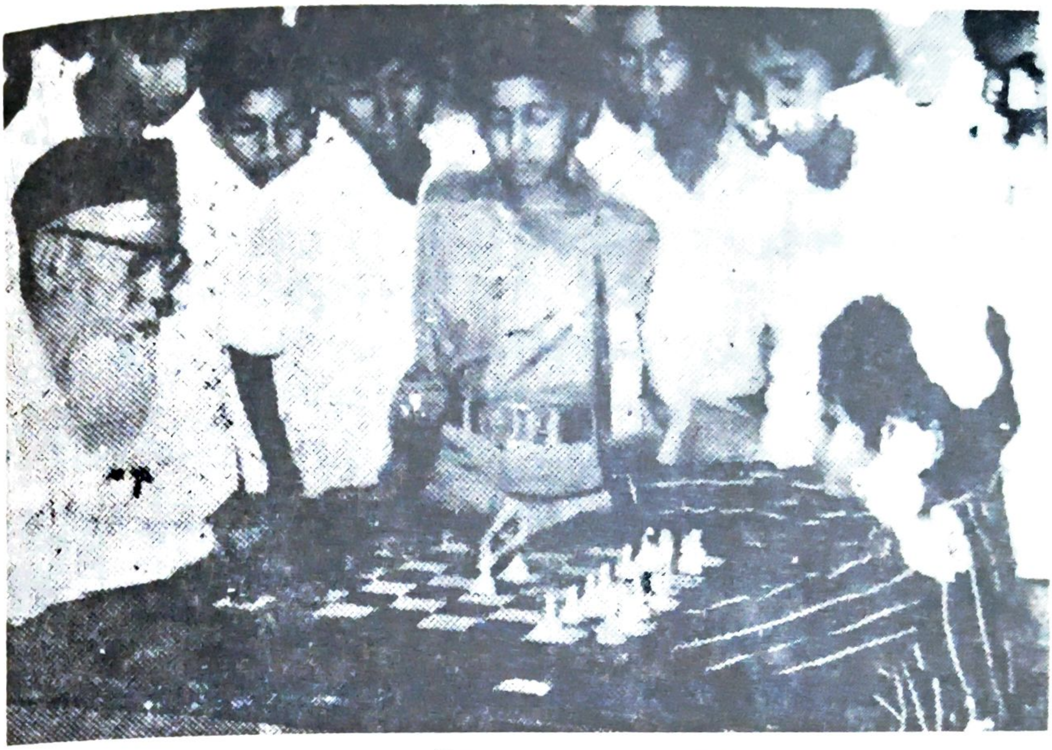


দাবাড়ু কাজী মোতাহার হোসেন

রয়েছে। সবটুকু বোঝো আর না-ই বোঝো রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিখানা পড়ে দেখো।

"আপনি বিচিত্র ভাবকে এবং আলোচনার বিষয়কে স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় রূপ দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি 'সঞ্চরণ' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তা পড়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আপনার বলবার সাহস এবং চিন্তার স্বকীয়তা সাধুবাদের যোগ্য। সাহিত্যপথে আপনার অধ্যবসায় জয়যুক্ত হোক এই কামনা করি।"

কাজী মোতাহার হোসেন সমাজ-সংসার, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, গান-বাজনা, বিজ্ঞান কত বিষয়েই যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার কী বলব। 'সঞ্চরণ' বইতে 'একজামিনেশন হল' নামের এক প্রবন্ধে মজা করে লিখেছেন, পরীক্ষা দিতে গিয়ে একবার দেখেন 'পরীক্ষার হল' রচনা লিখতে বলা হয়েছে। আসলে সত্যি সত্যিই কি আর ওরকম প্রশ্ন আসে? মোটেই না। ভেবে মজা পাচ্ছেন, ওরকম হলে কেমন হত? লিখছেন— "কেন যে আমাদের ঘরের বাইরে বসে লিখতে দেয় নি, সেই আশ্চর্য। অন্যের কথা



খেলাঘরের শিশুদের সঙ্গে দাবা খেলছেন

বলতে পারি না, আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে পরীক্ষার হল দেখে দেখে রচনা লিখতে শুরু করলাম।" দেখে লেখা অর্থাৎ দিব্যি নকল করবার কথা! কেমন দুষ্টুমির কথা তাই দেখো!

সেকালে মুসলমান ঘরে হাসিখুশি বড় কম ছিল। কিন্তু ঘর-সংসারকে "ফুলবাগান"-এর মতন সাজিয়ে তুলে জীবনটাকে আনন্দে ভরে তুলতে না পারলে জীবনের কি কোনো অর্থ থাকে? 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' প্রবন্ধে কাজী সাহেব বলেছেন—পাতার নাচে কী সুন্দর মর্মর শব্দ হয়, ভোরবেলায় পাখির গানে কত আনন্দের সুর। আর আমরা পৃথিবীর সেরা জীব হয়ে জীবনের ভিতরে আনন্দের ছন্দ তৈরি করতে পারি না কেন? প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারলেই সমাজ "প্রাণময়" হয়, "গৃহে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে" আর "মন সরস ও সচেতন" হয়। বাবা-মা ভাই-বোন সবাই মিলে খোলামেলা আলাপ করতে পারলে জীবন সহজ হয়। কিন্তু মুসলমান ঘরের হালচাল কী? "মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না", "মুসলমান

পুরুষেরা কেবল কাজ করবে", "মেয়েরা কেবল রাঁধবে বাড়বে", "মুসলমান বাপের সামনে হাসবে না, বড় ভাইয়ের সামনে খেলবে না, গুরুজনের অন্যায় কথায়ও প্রতিবাদ করবে না, —এমনকি কচি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত মার খেলেও চেঁচিয়ে কাঁদবে না।"

বোঝো একবার সেই সময়কার অবস্থাটা। আর কাজী মোতাহার হোসেন সেই সময়ের চেয়ে কতটা এগিয়ে ছিলেন, বুঝতে পারছ? তিনি যা চেয়েছিলেন তা ঘরে ঘরে দেখা দেয় নি এখনো, তবু আমাদের সমাজ সেদিনকার মতন ওরকম আড়ষ্ট নয় আর। সমাজের মানুষকে সহজ সুন্দর জীবনের দিকে টেনে এনেছেন এঁরা দিনে দিনে।

কাজী মোতাহার হোসেনের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখা "প্রাঞ্জল" কথাটা কাজী সাহেবের নিজের খুব পছন্দ ছিল। ঐ শব্দটির চেহারা যতই জটিল দেখা যাক না কেন ওর অর্থ কিন্তু 'সরল'—যা সহজেই বোঝা যায়।

কাজী মোতাহার হোসেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি কত শ্রদ্ধা রাখতেন আর কেমন করে তাঁর ভাষার সহজতার অনুসরণ করেছেন সে-কথা তাঁর লেখা পড়ে জানা যায়— কী লিখছেন দেখো—

"একটি প্রবন্ধ পড়লাম ('পদ্মায় তখনও রেলপুল হয়নি' বলে আরম্ভ) তাতে ছিল লোকের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে সমতলতা আর অবাধ চলাচল সম্বন্ধে সুপ্রযুক্ত আলোচনা। আমার মন তাতে পুরাপুরি সায় দিল। এই হল আমার গোপন শিষ্যত্ব। প্রায় ঐ সময়েই আর একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর কোনো সামাজিক মেলামেশা নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনের সম্পর্ক । প্রাণের স্পর্শহীন মুখের ডাকে তারা যে সব সময় সাড়া দেবেই এ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এমন সহৃদয়ভাবে আর কোনো সাহিত্যিক মুসলমান সমাজের কথা এবং হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক মানবীয় সম্প্রীতির কথা ভেবেছেন বা প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।"

রবীন্দ্রনাথের লেখার ভাষা আর নানান বিষয়ের আলোচনা কাজী মোতাহার হোসেনের মনকে খুব ছুঁয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি কাজী সাহেব ছিলেন আরও বেশি অনুরক্ত। সেক্ষেত্রেও নজরুলের জাত-ধর্ম বিষয়ে উদারতা কাজী সাহেবকে

আকর্ষণ করেছিল। নজরুলকে 'মানুষের কবি' নাম দিয়ে ইনি লিখেছেন—"নজরুল ইসলাম জীবনে জাত-বিচার মানেন নি— ইসলামের প্রধান শিক্ষা সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাতবিচারের ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ,
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'খান।"

কাজী মোতাহার হোসেন -এর 'সঞ্চরণ' বই প্রকাশ হবার পরে বইয়ের এক কপি তিনি তাঁর মেয়ে 'মিনু' আর 'ভোঁটলা'কে দিয়েছিলেন। মিনুর বয়স কিন্তু তখন ৪/৫ বছর! ভোঁটলার ৮/৯! বড় বড় আরও মেয়ে থাকতে এই দুই শিশুকে দেওয়া কেন? কারণ স্বভাবটা যতই উদাসীন হোক, তিনি ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে তাঁর এই দুটি মেয়ের ভেতরে ছেলেবেলাতেই রসের বোধ জন্মে গেছে। সেকালের স্কুলের পাঠ্য বই বাছাইয়ের যে-কমিটি ছিল সেই কমিটি কাজী মোতাহার হোসেনকে অনেকগুলো রচনা, ব্যাকরণ, অঙ্ক বই থেকে ভাল বইটি বাছাই করে দেবার দায়িত্ব দিতেন। কাজী সাহেব রচনা আর ব্যাকরণের বই এনে 'মিনু' (সন্‌জীদা)-কে দিয়ে বলতেন— "দ্যাখ তো এগুলোতে কোনো ভুল-টুল আছে কিনা।" অঙ্কের বই নিয়ে গিয়ে দিতেন ছেলেদের (কাজী আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহবুব হোসেন)— "দ্যাখ তো ভুল-টুল বার করতে পারিস কিনা।"

ছেলেমেয়েরা তো বই নিয়ে হামলে পড়ত ভুল বার করতে! তাঁর চালাকিটা ধরতে পেরেছ তো তোমরা? ব্যাকরণ, অঙ্ক এসব বিষয়গুলো দিব্যি এমনি কায়দা করে পড়িয়ে ফেলতেন তিনি সরল ছেলেমেয়েদের।

ওসব কায়দা ছিল ভালই। কিন্তু বই নিয়ে পড়াতে বসলে খুব একটা ধৈর্য রাখতে পারতেন না। বিশেষ করে মেয়েদের অঙ্ক করাতে গিয়ে প্রায়ই রেগে কথা হারিয়ে ফেলতেন। তারপরে বলতেন— "ইয়েটিয়ে করে, গাধা সব!"

নিজেদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির উপরে একটা আস্থা থাকে মানুষের। সেই বুদ্ধির প্রমাণ যখন পাওয়া যায় না, তখন বাবা-মায়েরা একদম ধৈর্য ধরতে পারেন না। এটা খুবই দেখা যায়।

কাজী মোতাহার হোসেন বাঙালি মুসলমানদের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন করেছেন সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি মুক্তবুদ্ধির মানুষের সঙ্গে মিলে। এই মুসলিম সাহিত্য সমাজ দলটির সাথে 'শিখা' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদনাও করেছেন তিনি। সেই যে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে কাজী সাহেব নজরুলকে নিয়ে যেতেন, সেই মৈত্র মশায় নাকি বলতেন—কাজী আব্দুল ওদুদ হচ্ছেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর 'মস্তিষ্ক', সৈয়দ আবুল হুসেন 'হাত-পা-দেহ' আর কাজী মোতাহার হোসেন এর 'হৃদয়'। বাঙালি মুসলমান সমাজকে চিন্তার দিক থেকে সবল করে তুলবার জন্যে ঐ মস্তিষ্ক, দেহ আর হৃদয় একত্র মিলে কাজ করেছেন সেই ১৯২৬ সালে। এঁরা সেদিন বাঙালি মুসলমানদের এই বলে সাবধান করছিলেন যে, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" আজকের দিনে মুসলিম সাহিত্য সমাজ আর 'শিখা' পত্রিকা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। 'শিখা'গোষ্ঠীর তরুণতম সদস্য আবদুল কাদির পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে তাঁর মৃত স্ত্রীর নামে 'দিলরুবা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে কাজী সাহেবকে সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন। পত্রিকাটি অনেকদিন চলেছিল। অনেক নতুন লেখক তাতে লিখে হাত মকশো করেছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন নবীন লেখকদের বইয়ের আলোচনা লিখে তাদের উৎসাহিত করতেন। দেশ ভাগ হবার পরে কত লেখক যে কাজী সাহেবের স্নেহ-ভরা উপদেশে সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই। দেশ ভাগ হবার পরে নানা সাহিত্যসভায় যোগ দেওয়া আর সভাপতিত্ব করা তাঁর একটা বড় কাজ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া অনেকদিন ধরে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র সভাপতি হিসেবে এদেশের গুণী লেখকদের পথের দিশা দিয়েছেন তিনি। বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী বাংলা ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড ইত্যাদির শুরু থেকেই সব কাজে-কর্মে কাজী মোতাহার হোসেন যুক্ত থেকেছেন। সাহিত্যসভার জন্য, পত্র-পত্রিকার জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার না করে বাংলা সম্পর্কে পাকিস্তানিদের নানারকম অবজ্ঞা-অবহেলা দেখে কাজী সাহেব অনেক আগেই বলেছিলেন, এরকম চললে, বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসনে থাকতে পারবে না। তাঁর ভাষায় "ধূমায়িত অসন্তোষ

বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।" সে কথা যে ফলেছে সে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজ।

কাজী মোতাহার হোসেনের একটি বইয়ের নাম 'নজরুল-কাব্য-পরিচিতি'। এই বইটির জন্মের একটা ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেব বসু তো খুব নাম করা সাহিত্যিক আর সমালোচক! ইনি তাঁর একটি ইংরেজি বই (An Acre of Green Grass) নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে ওতে নানা বিষয়ের মধ্যে আগাগোড়া কোনো সঙ্গতি নেই। কোনো নজরুল-ভক্ত কাজী মোতাহার হোসেন তাই না পড়ে রাগে ফুঁসতে লাগলেন। তাঁর মতে, এ কথা যারা বলে তারা নজরুলের কবিতার মর্মই বুঝতে পারে নি। ব্যস, অমনি কলম ধরে বিদ্রোহী কবিতার বিস্তৃত সরস পরিচয় লিখতে বসে গেলেন। এই লেখাটির পরেই নজরুলের সৃষ্টির সকল ভাবের কথা নিয়ে নজরুল-কাব্য-পরিচিতি লিখে বই ছাপান তিনি। কাজী মোতাহার হোসেনের লেখাগুলো এখন বাংলা একাডেমী থেকে 'কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী' নামে চারটি খণ্ডে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। সভা সমিতিতে নজরুলের কথা বলতে গিয়ে গান গাইতে শুরু করলে ওঁকে থামানো কঠিন হত। গানের দিকে ঝোঁক ছিল বলে পুরোনো বাংলা গান, ডি. এল. রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল)-এর গান, রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান সবেতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। ঠিকঠাক তাল মেনে গাইতে না পারলেও গেয়ে যেতেন, শুনতেও ভালবাসতেন। তবে চল্লিশ সালের প্রথম দিক থেকেই কানে কম শুনতে পেতেন বলে গান কেন, জোরে জোরে না বললে, কথা শুনতেও অসুবিধে হত তাঁর।

১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রনাথের গড়ে-রেখে-যাওয়া শান্তিনিকেতনে 'সাহিত্য-মেলা'তে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ে বলতে গিয়ে ভাষাতে হিন্দুয়ানি বা মুসলমানি ভাব ঢুকানোর জবরদস্তি নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"তাহলে কি আমরা 'জলপানি'কে 'পানিপানি' বলব আর হিন্দুরা 'পানিপথ'কে বলবে 'জলপথ'!"

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল যুক্তিপূর্ণ আর উদার। সব ধর্মের মহাপুরুষদের জীবনকথা তিনি পড়তেন, তাঁদের নিয়ে লিখতেন। মুসলমানের কর্তব্য হিসেবে সস্ত্রীক হজ করেছেন তিনি। স্কুলে যা সামান্য

আরবি পড়েছিলেন নিজে নিজে চর্চা করে সেই বিদ্যা দিয়েই কাজী সাহেব কোরান শরিফের কিছু কিছু অনুবাদ করতেন। ইংরেজি থেকেও কিছু অনুবাদ তিনি করেছিলেন। বাংলার, অঙ্কের, জ্যামিতির, ট্রানস্লেশানের, স্ট্যাটিসটিক্সের, ফিজিক্সের অনেক পাঠ্যবই তিনি লিখেছেন।

সারা জীবনের সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পাকিস্তান আমলে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (১৯৬০) উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার। বাংলাদেশ আমলে স্বাধীনতা দিবসের পুরস্কার (১৯৭৯) পেয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এসসি. ডিগ্রি পেয়েছিলেন আগেই বলেছি। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মান দেন। এছাড়া বাংলাদেশ আমলে তিনি 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' (১৯৭৭) আর 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৮০) পেয়েছিলেন। আর নানা জায়গা থেকে নিত্যই তিনি পেয়েছেন মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। সবচেয়ে বেশি করে যে-ভালবাসা তাঁকে ধন্য করেছিল, তাঁর জীবনের কঠিন সাধনার সকল কাঁটা থেকে প্রফুল্ল গোলাপ ফুটিয়ে তুলেছিল সে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ নজরুলের প্রীতিসম্ভাষণ— 'মোতিহার' নাম।

প্রিয় ছাত্রদের কাছ থেকেও তিনি কত যে ভালবাসা পেয়েছেন! প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন তাঁর দাবা খেলার সাগরেদ। বৃদ্ধ বয়সেও রোজ সন্ধ্যায় দাবা খেলার টানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্লাবে যাওয়া চাই। কাজী সাহেবের ওই বয়সে মাথা কি আর তত খেলে! দাবা হচ্ছে যুবা বয়সের বুদ্ধির খেলা। তবু ঐ খেলা তিনি ছাড়তে পারতেন না। তাঁকে দেখে আর সকলে পালালেও প্রিয় শিষ্য রাজ্জাক সাহেব পালাতেন না। রাজ্জাক সাহেবকে হেসে হেসে গল্প করতে শুনেছি যে কাজী সাহেবের শেষ জীবনে ইচ্ছে করে ভুল চাল দিয়ে হার মেনে নিতেন ইনি। না হলে কাজী সাহেব যে দুঃখ পাবেন, রাজ্জাক সাহেবের পক্ষে তাঁকে সে-দুঃখ দেওয়া সম্ভব ছিল না। রাজ্জাক সাহেব আপন তরুণ বয়স থেকেই কাজী সাহেবের সঙ্গে দাবা খেলেছেন, তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের ভাল ছাত্র আবুদুল্লাহ আল-মুতী ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেনের প্রিয় ছাত্র। প্রিয় হবার কারণ শুধু পাঠ্য বিষয়ে ছাত্রের দখল নয় কিন্তু। আল-মুতীর সাহিত্যের প্রতিও টান ছিল। আর নানা বিষয়ে

ছিল তাঁর আগ্রহ। কাজী মোতাহার হোসেন বলতেন কেবল বইয়ে মুখ গুঁজে থাকলে কি সত্যিকার লেখাপড়া হয়! সত্যি সত্যি মানুষ হতে হলে চারদিকের সব বিষয় জানতে শিখতে হবে।

সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল বলে তাঁর তথ্যগণিতের ছাত্র কাজী ফজলুর রহমানকেও আন্তরিক স্নেহ করতেন কাজী সাহেব। ইনিও ছাত্র ভাল ছিলেন তো বটেই, সাহিত্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন। ভুলো স্বভাবের কাজী সাহেবের লেখাগুলোকে যত্ন করে ফাইলে বেঁধে গুছিয়ে রেখেছিলেন তাঁর এই গুণমুগ্ধ ছাত্র। লেখাগুলো গুছানো ছিল বলেই 'মুক্তধারা'র চিত্তরঞ্জন সাহা 'কাজী মোতাহার হোসেনের নির্বাচিত প্রবন্ধ' সংকলনটি ছাপতে পেরেছিলেন।

আরেক প্রিয়জন ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেনের। ইনি দর্শনের ছাত্র সরদার ফজলুল করিম। এঁর সাহিত্যপ্রীতি আর মানুষের প্রতি দরদের জন্য কাজী সাহেব এঁকে স্নেহ করতেন।

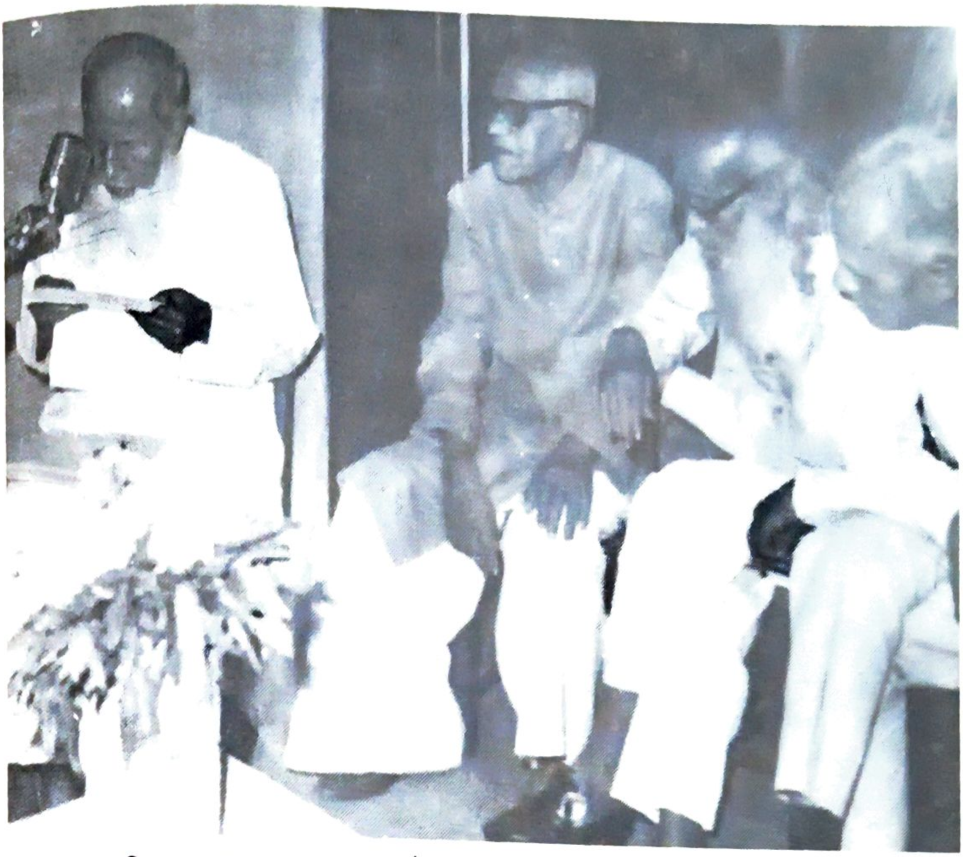
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক বাছাই আর তাঁদের পদোন্নতির ব্যাপারে কাজী সাহেবের মতামতকে মূল্য দেওয়া হত। সৈয়দ আলী আহসান আর মুনীর চৌধুরী ইংরেজির এম. এ. হলেও সাহিত্যবোধ রয়েছে বলে তাঁদের দু' জনকে বাংলার শিক্ষক করবার ব্যাপারে কাজী সাহেবই জোর দিয়েছিলেন। আর ওঁরা দু' জনেই বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে অনেক সুনাম পেয়েছিলেন।

কাজী সাহেব বলতেন, বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল শিক্ষার জন্য অঙ্কের মূল বিষয়গুলো জানা যেমন জরুরি সাহিত্যচর্চার জন্য তেমনি পরিচ্ছন্ন ভাষাজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ বাক্য লেখা আর লাগসই শব্দ ব্যবহার করবার ক্ষমতা জরুরি। তাই অঙ্কের বেলায় গোড়ার বিষয়গুলো ছাত্রের জানা আছে কিনা দেখে নিতেন। আর, সাহিত্যবিচার করতে গেলে দেখতেন ভাষা ঠিক আছে কিনা। অনেক রথী-মহারথীর ভাষা তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন কত সময়।

মায়ের মুখের ভাষায় লেখাপড়া শেখার পক্ষ নিয়ে মোতাহার হোসেন অনেক লেখালিখি করেছেন। বলতেন নিজের ভাষায় পড়ালেখা করলেই ঠিকমতো শিক্ষা হয়।



খ্যাতিমান পুত্র-কন্যাদের কয়েকজন কাজী আনোয়ার হোসেন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুন, চতুর্থ কন্যা জাহেদা খাতুন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও লেখিকা সন্‌জীদা খাতুন, চিত্রশিল্পী ও সংগীত শিল্পী মাহমুদা খাতুন



সওগাত সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা পাঠ করছেন কাজী মোতাহার হোসেন, পাশে রয়েছেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন প্রমুখ

গুলবাগে ফুল চায় বিদায়

১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর তারিখ শুক্রবার বকরি ঈদের দিন সকালবেলা তাঁর মৃত্যু হয়। কৈশোরে কুস্তি খেলে গড়ে-তোলা শক্ত কাঠামোর শরীরের দরুন কোনো অসুখ তাঁকে কবজা করতে পারত না। শুধু কুস্তি কেন, সারাজীবনে হেঁটেছেন কি কম! বাহাদুরপুর গ্রাম থেকে সেনগ্রামের স্কুল অনেকখানি দূরে। যাওয়া-আসা ছিল হাঁটাপথেই। শহরের ছাত্রজীবনেও হাঁটাহাঁটি করে শরীরকে সবল রেখেছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। ষাট বছর বয়সের পরেও হেঁটে অথবা সাইকেলে চড়েই তিনি পথ



দাবা খেলা ছিল তাঁর আজীবন নেশা, শেষ বয়সেও তার বিরাম ছিল না। নিচের ছবিতে কবি জসীম উদ্‌দীন ও অন্যান্যের সাথে কাজী মোতাহার হোসেন



পাড়ি দিতেন অকাতরে। মজার কথা এই যে, কার্জন হলের পূর্ব দিকের গেটটি কখনো তালা বন্ধ থাকলে কাজী সাহেব বেয়ে উঠে গেট টপকাতে কোনো দ্বিধা করতেন না। ওই একমুখ পাকা চুল-দাড়িওয়ালা মানুষটি কিনা গেট টপকাচ্ছেন। ভাবো একবার!

কিন্তু যত যা-ই হোক, মৃত্যুকে কি ঠেকানো যায়! কাজী সাহেবের শরীরে কোনো দোষ পাওয়া যেত না। কেবল ভুলে যেতেন বেশি বেশি। আর আগেই বলেছি, কানে কম শুনতেন। তো, ভুলে-যাওয়া দোষের সঙ্গে মগজের যোগ আছে, সে-কথা সবাই জানে। ডাক্তাররা তাঁকে হাসপাতালে ধরে রাখতে চাইতেন, অনেক বেশি বয়সের দোহাই দিয়ে। কিন্তু হাসপাতালে থাকা মানেই মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষা করা। আর সুঁই দেখলেই কাজী সাহেব শিউরে উঠতেন। কিছুতেই হাসপাাতালে থাকতে চাইতেন না। মগজের শিরাগুলোতে রক্ত চলাচল কমে গেলে যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, কাজী সাহেবের সেই সব অসুবিধার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রথম বার হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাসায় নিয়ে আসবার পরে একদিন তাঁর দাবা খেলার সঙ্গী, ছেলের বন্ধু শরফুদ্দীন হাই তাঁকে দেখতে এল। ঘটনাচক্রে সঙ্গে ছিলেন তার বন্ধু ডাক্তার রশিদউদ্দীন। ইনি মগজের কাটা-ছেঁড়া করবার নাম-করা ডাক্তার। রশিদউদ্দীন ওঁকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে বিড়বিড় করে কী একটা ওষুধের নাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের সহচর সেবক জসিমউদ্দীন (জজু বা যদু) সেই ওষুধের নাম লিখিয়ে নিয়ে নিয়মমতো খাওয়াতে শুরু করল। আশ্চর্য ফল! কাজী সাহেব কিছুদিনের ভিতরেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আগের মতন আর কথা ভোলেন না। অন্তত বছর দুই ভাল ছিলেন তারপরে। রেডিওতে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তারপরে ধীরে ধীরে স্মরণশক্তি খুবই কমে গেল। কোনো এক মধ্যরাত্রিতে তাঁর পরিচারক হঠাৎ জেগে দেখে কাজী সাহেব বিছানাতে নেই। ছুটে গিয়ে দেখতে পেল বাথরুমের সামনে পড়ে আছেন উপুড় হয়ে। ধরাধরি করে এনে বিছানায় শোয়ানো হল। সকালের দিকে লক্ষ করা গেল তিনি কেবলই ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার এসে সন্দেহ করলেন মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে রক্তপাত হয়েছে, তাই দেহের একটা দিকের সাড় কমে যাচ্ছে। সেই যে হাসপাতালে গেলেন, সেখানে গভীরতর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ওই অবস্থাতেই নিস্তেজ হতে হতে অক্টোবরের

৯ তারিখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কাজী মোতাহার হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী ছুটে এসে বললেন ওঁকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে নজরুল ইসলামের পাশে কবর দিতে চাই। কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেন অনেক আগে থেকেই বাড়ির লোকদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যে যা-ই বলুক, তাঁকে যেন স্ত্রী সাজেদা খাতুনের পাশেই কবর দেওয়া হয়। স্ত্রীর কবরের সঙ্গেই তাঁর কবরের জমি কিনে রাখা হয়েছিল তাই। ঢাকাতে কাজী মোতাহার হোসেনের নিজের বাড়ির ঠিকানা ছিল ১১৩ সেগুন বাগান। এ বাড়ি ছিল তাঁর স্ত্রীর নামে। তাই বনানী গোরস্থানে ১১৩ নম্বর কবরে সাজেদা খাতুনের শেষশয্যা পাতা হয়েছিল। স্ত্রীর পাশে ১১২ নম্বর কবরে কাজী মোতাহার হোসেনের জন্য চির বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

সহজ সরল সাদাসিধে আর নিরহংকার অথচ এমন বিজ্ঞ সাধক চরিত্র আজকাল খুব একটা দেখা যায় না।



কাজী মোতাহার হোসেন— এই মস্ত বড় নামের মানুষটিও নাকি স্বপ্নে উড়ে বেড়াতেন। নিজেই লিখেছেন– "প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, আমি উড়তে পারি, ডানা না থাকলেও শুধু হাত নেড়েই পারি। উড়ে গিয়ে কখনো আমগাছের উপরে কখনো বা বাঁশের ঝাড়ে কোনো বাঁশের আগায় গিয়ে বসতাম। অনেক সময় হুমোবুড়ি সেখানেও তাড়া করত, তখন হয়ত উড়ে গিয়ে তেঁতুল গাছের আগায় বা হিজল গাছের কোটরে আশ্রয় নিতাম।"

I S B N 984-09-0389-6